দৈনিক বাংলা

০৯ SEP 1993

তারিখ 09 SEP 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

সাক্ষরতা ঃ সংকট এবং দায়-দায়িত্ব

সারা দেশে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদযাপিত হয়ে গেল। এ উদযাপনা নতুন কিছু না। উনিশ শ ছেষট্টি সালে ইউনেস্কো এ দিবস উদযাপনা চালু করে। লক্ষ্য—নিরক্ষরতা বিমোচন এবং শিক্ষার প্রসারের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা, শিক্ষিত সমাজ গঠনে সহায়তা করা।

সেই থেকে অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও এ দিনটি পালিত হয়ে আসছে। তবে অন্যান্য বছরের সঙ্গে এবারকার উদযাপনার কিছু পার্থক্য আছে। বাণী প্রচার, র‍্যালী আর আলোচনা অনুষ্ঠান তথা কর্মসূচীর দিক থেকে পার্থক্য তেমন কিছু নেই। পার্থক্যটা পটভূমিগত। এবারকার উদযাপনার পটভূমি সম্পূর্ণ ভিন্ন।

এ পার্থক্য অনুধাবনের জন্যে একটু পেছনে ফিরে তাকানোর দরকার আছে। ছেষট্টি থেকে তিরানব্বই সময়টা নেহাত উপেক্ষাযোগ্য নয়। সময় দিয়ে যদি এ উদযাপনার সার্থকতা বিচার করা হয় এ উদযাপনা নিয়ে উল্লাসের কিছু থাকে না। ছেষট্টিতে আমাদের সাক্ষরের হার ছিল মোট জন সংখ্যার কুড়ি শতাংশের মত। এতদিন পরে আমরা এখন দাবি করতে পারছি, এ সংখ্যা তিরিশের কাছাকাছি পৌঁছেছে। এ বৃদ্ধিকেও সকলে নির্ভরযোগ্য বলে মানতে চান না। সঙ্গতভাবেই বলা চলে, দিবস পালনে আমাদের তেমন কিছু ফায়দা হয়নি।

এই না হওয়ার কারণটা বোঝার চেষ্টা করলেই পার্থক্যের স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে উঠবে। বছর বছর উদযাপনার ঘটা থাকলেও এর সঙ্গে আন্তরিকতার কোনো যোগ ছিল না। আনুষ্ঠানিকতায় তাই সাময়িক চমক সৃষ্টির অধিক কিছু ঘটেনি। শিক্ষা বিষয়টিকে সকল আমলেই রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের উপলক্ষ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। অনেক গালভরা বুলি আর আশ্বাস উচ্চারিত হলেও শিক্ষা প্রশ্নে কোনো রাজনৈতিক সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়নি। দীর্ঘ সময় এভাবেই অতিবাহিত হয়েছে।

আন্তরিকতাহীন উচ্চারণের স্বরূপ উদঘাটনের জন্যে এটুকু উল্লেখই যথেষ্ট যে, যে সময় উনিশ শ আশি সনের মধ্যে নিরক্ষরতা সম্পূর্ণ দূর করার আশ্বাস ঘোষিত হয়, তখন কার্যত এ লক্ষ্য পূরণের চাহিদা সম্পর্কেই কোনো ধারণা কোথাও ছিল না। এমন কি সাক্ষরতার সংজ্ঞা নির্ণয়েরও কোনো চেষ্টা কোথাও দেখা যায়নি। নাম সই করতে শেখানোর মত তাৎপর্যহীন উদ্যোগকেই সাক্ষরতা বিস্তারের চূড়ান্ত মনে করা হয়েছে।

দৃষ্টিভঙ্গিগত 'কার্যকর পরিবর্তনের' জন্যে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে হয়। তিনিই 'ব্যবহারযোগ্য ন্যূনতম শিক্ষা'য় সাক্ষরতার সংজ্ঞা নির্ধারণ করে গণশিক্ষার ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণে উদ্যোগী হন। তাঁর অকাল মৃত্যু এবং স্বৈরাচারের প্রতিষ্ঠা এ উদ্যোগকে আবার পেছনে ঠেলে দেয়।

আজকের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। স্বৈরাচারের পতনের পর গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় এসেছে। আর গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধান হিসাবে ক্ষমতা গ্রহণের পরই বেগম জিয়া নিরক্ষরতার অভিশাপ বিমোচনের সুদৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার ঘোষণা করেছেন। এই ঘোষণার পরিপূরক বাস্তব কর্মসূচীও হাতে নেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন, 'শিক্ষার জন্যে খাদ্য' কর্মসূচী চালু করা এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচীর কথা উল্লেখ করা যায়।

তিরানব্বইর উদযাপনার এ পরিবর্তিত পটভূমিতে আনুষ্ঠানিকতা ও আন্তরিকতার স্পর্শে প্রেরণাদায়ী হয়ে উঠবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। শিক্ষার মৌলিক অধিকার মিটলে জীবনের অন্যবিধ চাহিদা পূরণের পথও সুগম হয়ে উঠবে সন্দেহ নেই। সাক্ষরতা দিবসের প্রতিটি উচ্চারণ কার্যে রূপান্তরিত হয়ে উঠবে, এটাই আমাদের কাম্য।

পটভূমি বদলেছে। আশা করার মত পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এর পরও কি শিক্ষার প্রশ্নে আমরা মুক্ত মনে আশাবাদী হওয়ার শক্তি রাখি? সত্য বলতে গেলে নেতিবাচক জবাবই দিতে হবে। কেননা, সাক্ষরতা বিস্তার সে তো নেহাতই এক পরিপূরক কর্মসূচী। শিক্ষায় যে ঘাটতি পড়ে আছে, যারা সাধারণ শিক্ষার আওতায় আসতে পারেনি বা পারছে না, ব্যবহারযোগ্য ন্যূনতর শিক্ষা দিয়ে তাদের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর আওতায় নিয়ে আসা কিংবা একটি মৌলিক অধিকার তাদের হাতে তুলে দিয়ে জনশক্তির উন্নয়নই তো এ লক্ষ্য। মূল শিক্ষাই যদি অনিশ্চিত হয়, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাই যদি মুখ থুবড়ে পড়ে, একটা পরিপূরক কর্মসূচী নিয়ে কতদূর এগোনো সম্ভব?

এই একটি জিজ্ঞাসার কাছে এসে আমাদের সকল উচ্ছ্বাস হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়ার উপক্রম করে। শিক্ষাকে তাই সাক্ষরতা দিবসের উদযাপনার জন্যে তুলে না রেখে প্রতিদিনের ভাবনায় স্থান দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার ধারা বাধাহীন না হলে পরিপূরক শিক্ষা কার্যক্রম দিয়ে উদ্ধার পাওয়ার উপায় নেই।

সাক্ষরতা থেকে উচ্চতম শিক্ষার সংকট নিরসনের প্রশ্নেও আশাবাদী হওয়ার কারণ নেই এমন না। শিক্ষা প্রশ্নে সরকারের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেহাত সাক্ষরতা বিস্তার বা প্রাথমিক শিক্ষাতেই সীমাবদ্ধ নয়। ব্যয় বরাদ্দ থেকে সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি সর্বত্রই সরকারের আন্তরিকতার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। উদযাপনা উপলক্ষে সরকারের পাশাপাশি বিরোধী দলের শুভেচ্ছাবাণীও দেখতে পাওয়া যায়। শিক্ষার অনিশ্চয়তা তবু কেন কাটছে না, এ বিষয়টি তলিয়ে দেখতে হবে। অবস্থাই প্রমাণ করে, কোথাও না কোথাও আন্তরিকতার অভাব রয়ে গেছে। দুর্বলতার এ উৎসটি সনাক্ত করে এর প্রতিকারে মনোনিবেশ আবশ্যিক। শিক্ষা যদি বিঘ্নমুক্ত হয় তার প্রভাবেও সাক্ষরতার বিস্তার ঘটতে থাকবে। আজ যা আয়াশসাধ্য মনে হয়, তখন তা অনায়াস হয়ে উঠবে। সাক্ষরতার বিস্তারও সর্ব অর্থেই সাংস্কৃতিক অগ্রগতি। আর সংস্কৃতির অগ্রগতি সব সময়ই উপর থেকে ছড়ায়। উচ্চ স্তরে বন্ধ্যাত্ব জাঁকিয়ে থাকলে শত চেষ্টাতেও বিস্তার হওয়ার নয়।

শিক্ষা আর সাক্ষরতার তাগিদ জোরদার হয়ে ওঠার অন্যতম কারণ হচ্ছে আমরা একুশ শতকের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি। একুশ শতকের সাফল্য সমৃদ্ধি সবই নির্ভর করবে প্রযুক্তি দক্ষতার উপর। এ নেহাত উন্নত প্রযুক্তি অবলম্বনই নয়, প্রযুক্তির প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার প্রশ্নও এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। নিরক্ষরতা আর শিক্ষায় পশ্চাৎপদতা নিয়ে এ প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার আশা করা যায় না। সমাজ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব যাদের হাতে, আর যারা এ দায়িত্ব হাতে পেতে চান, তাদের সকলকেই এ দিকটি গুরুত্বের সঙ্গে ভাবতে হবে।

আশার কথা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সদ্যসমাপ্ত কাউন্সিলে একুশ শতকের এ চ্যালেঞ্জ সামনে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। এ কেবল একটি দলের সমস্যা বা দুর্ভাবনার কারণ নয়। সবার ভাগ্যই এর সঙ্গে সমানভাবে জড়িয়ে। সকলকেই তাই শিক্ষার বিঘ্ন দূর করে, সাক্ষরতা বিস্তারে অবদান রেখে প্রাথমিক দায়িত্ব আদায়ে ব্রতী হতে হবে।

বিশ্ব সাক্ষরতা দিবসের এবারকার উদযাপনার কতিপয় আশাবাদী দিক নিয়ে আমরা আনন্দিত। তবে এ আনন্দকে স্থায়ী করতে হলে আরো অনেক কিছুই করার রয়েছে। যার কিছু আভাস রাখার চেষ্টা করা হয়েছে এ নিবন্ধে। আমাদের উদ্যোগের সাফল্যই এর লক্ষ্য। শিক্ষক আর সমাজকর্মীরা অন্তত যদি এ বিষয়গুলো নিয়ে ভাবেন, অবস্থান নির্বিশেষে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যদি নিজেদের দায়িত্বটুকু পালনে তৎপর হন, দুঃখ করার কারণ দূর হতে সময় লাগবে না বলেই আমাদের বিশ্বাস। কোনো জাতিই দরিদ্র হয়ে, অশিক্ষিত হয়ে থাকতে চায় না। নেতৃত্বের দুর্বলতাই এমন দুর্দশা অনিবার্য করে তোলে। সে নেতৃত্বকে যে সব সময় ক্ষমতার অধিকারীই হতে হবে এমন না।

বৈষয়িক প্রয়োজনের কথা বাদ দিলেও বিশ্বাসের তাগিদে আমাদের প্রতিটি নর-নারীকে শিক্ষিত হতে হবে। সাক্ষরতা দিবসের ডাক আমাদের কাছ থেকে তাই ব্যর্থ হয়ে ফিরতে পারে না।

—সালেহ চৌধুরী